Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume –2, Issue-II, published on April 2022, Page No. 151–157
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848 (Online)

পুরুলিয়ার টুসুগান : নারীর অন্তর্বেদনা

সঞ্জয় কুমার
গবেষক, বাংলা বিভাগ
সিধো-কনহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়
ই-মেইল: sanjaykumarprl0@gmail.com

Keyword
টুসু, নারী, পুরুলিয়া, টুসুগান, মর্মযন্ত্রনা, বাল্যবিবাহ, অত্যাচার, বালিকা, শ্বশুর

Abstract
পুরুলিয়া জেলার একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় লোকসংগীত হল টুসুগান। সাধারণত "টুসুপার্বন" বা মকর- পরবকে কেন্দ্র করে এই টুসুগান গাওয়া হলেও বছরের অন্যান্য সময় বিভিন্ন কাজের সঙ্গে সঙ্গে এই জেলার নারীরা গুনগুন করে টুসুগান গায়। টুসু সাধারণত নারীদের উৎসব। অগ্রহায়ণ সংক্রান্তির দিনে পাড়ার কোনো একজনের বাড়িতে টুসুপাতা হয়। অগ্রহায়ণ সংক্রান্তি থেকে পৌষ সংক্রান্তি পর্যন্ত সন্ধ্যার সময় পাড়ার বালিকা-যুবতী-বৃদ্ধা সকলে একত্রিত হয়ে গান গায়। তাদের গানের বিষয় তাদের জীবনের সাথে সম্পৃক্ত।

বালিকা বয়স থেকে বৃদ্ধ হয়ে মৃত্যু পর্যন্ত একজন নারীকে কত রকমের সামাজিক নিয়মকানুন, বিধিনিষেধ, ও কুপ্রথার সঙ্গে লড়াই করে জীবন যাপন করতে হয় তারই মর্মান্তিক ছবি এই টুসুগানে ফুটে উঠতে দেখা যায়। বাল্য বিবাহ নারীসমাজে প্র- চলিত একটি অন্যতম সামাজিক ব্যধি, একটা দশ-বারো বছর বয়সী নারী বিবাহের পর শ্বশুরবাড়িতে যায় সেখানে কাজকর্ম করতে পারে না বলে শাশুড়ি-ননদের কাছ গালিগালাজ খেতে হয় তাকে। আমরা টুসুগানে পায়:

১। শাশুড়ি ননদী বড় কাল দেয় না দু মুঠা ভাত।
খাট্যে খাট্যে জীবন গেল হল্য রোগ বাত।

২। টুসু হামার ছুট্ট ছ্যালা শ্বশুর ঘরের বড় কলসী কাঁখে লিতে লারে গ।
বাঁধের ঘাটে কলসী রাখ্যে পালাঁয় আল্য বাপের ঘরে গ।

৩। কলঙ্কাটির জবা ফুলটি হলুদ বল্যে বাটেছি
ও শাশুড়ি গাল দিও না পাশা খেইলতে বস্যেছি।

এইরকম অবস্থা হয় নারীদের। সেই সঙ্গে সংসারের অভাবের সঙ্গে তাকে লড়াই করতে হয়। এই সাংসারিক অভাব এমন আকার ধারণ করে যে অনেক সময়—

১। হামার বাপে মায়ে বিহা দিল
বড় শ্বশুর ঘর দেখ্যে।
হামার জনম গেল মাড়ভাত খাত্যে

কাল কাটাব কেমনেতে।।

২। জনম দুঃখিনী মা গ হামি।
দু বেলা পেটে পড়ে না মাড়পনি।।
কাল যাব আড়শা হাটে।
শাল পাতা বিকব হাটে হাটে।।

খুবই মর্মান্তিক এই দৃশ্য। যেখানে দুবেলা আহার টুকুও ঠিকঠাক জোটে না।

মেয়েকে বালিকা বয়সে বিয়ে না দিলেও নানা গঞ্জনা সহ্য করতে হয়। আবার বিয়ে দিতে গিয়ে পণের দায়ে বাবা মাকে সর্বশান্ত হতে হয়। ফলে শ্বশুরবাড়িতে গিয়েও মেয়ের মনে একটা গ্লানি থেকেই যায়, আবার সেখানেও সুখ নেই; স্বামীরঘরে নিত্য অভাব-অনটন,শাশুড়ি-ননদের সঙ্গে কলহ। অনেক নারী শ্বশুরবাড়ির অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে আবা- র বাপের বাড়িতে ফিরে আসে। আমাদের আলোচ্য টুসুগানে এই বিষয়গুলো খুব সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। সংসারে নিত্য অভাব থাকার জন্য এই জেলার নারীদের প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়। এককথায় বলা যায় যে এই অঞ্চলের নারীকণ্ঠের বিখ্যাত লোকগান টুসু, যা একজন নারীর বালিকা বয়স থেকে বৃদ্ধা অবস্থায় পৌছানোর মাঝখানে যে সমস্ত সামাজিক কুপ্রথা, কুসংসার, অন্যায়, অনাচার সহ্য করতে হয় তারই অলিখিত ইতিহাস। নানা ধরনের সামাজিক অনুশাসনের ভয়ে নারীরা তাদের উপর সমাজের চাপিয়ে দেওয়া নিয়ম- কানুন ও বিভিন্ন ধরনের অত্যাচারের কথা সরাসরি ব্যক্ত করতে না পারলেও আজন্ম লালিত তাদের এই টুসুগানের মাধ্যমে সেই অব্যক্ত মর্মযন্ত্রনার প্রকাশ ঘটে।

Discussion

পুরুলিয়া জেলার একটি অন্যতম লোকউৎসব টুসুউৎসব বা টুসুপার্বন। এইটুসু উৎসব হল টুসুপূজা ও পূজাকেন্দ্রিক গানের সমাহার। প্রতিবছর মকরসংক্রান্তির দিনে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয় বলে এর স্থানীয় নাম "মকর পরব"। অগ্রহায়ণ মাসের শেষদিন(সংক্রান্তি) থেকে পৌষসংক্রান্তির দিন পর্যন্ত পুরো একমাস ধরে চলে টুসুপূজা ও সেই সঙ্গে টুসুগান। পাড়ার কোনো একজনের বাড়িতে টুসুপাতা (স্থাপন করা) হয় এবং প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় বালিকা যুবতী ও বিবাহিত মহিলারা সেই বাড়িতে একত্রিত হয়ে টুসুপূজা করে এবং গান গায়। এইগুলো সাধারণত দূই থেকে দশ লাইনের হয়ে থাকে এবং অনেকটা ছড়ার আকারে পরিবেশন করা হয়। প্রায় একমাস ধরে চলে টুসু গানের রেওয়াজ, অবশেষে আসে বাঁউড়ী (মকর সংক্রান্তির আগের দিন); ঐদিন টুসুর জাগরণ। মেয়েরা সারারাত গান গায়। আর বাঁউড়ীর পরের দিন অর্থাৎ মকর সংক্রান্তির দিন সকালে মেয়েরা তাদের আদরের টুসুকে বিসর্জনের উদ্দেশ্যে নিয়ে যায় নিকটবর্তী কোনো বৃহৎ জলাশয় বা নদীর ধারে। মেয়েদের সেই টুসু বিসর্জনের দৃশ্য খুবই রোমাঞ্চকর এবং এই সময় তারা দলবদ্ধভাবে গান গায়, বক্রোক্তির সুরে বিচিত্র বিষয়ের গান শুনতে পাওয়া যায় এই বিসর্জনের সময়।

এইভাবে টুসুগান পুরুলিয়ার জনমানসে চর্চিত হয়ে আসছে। বালিকা থেকে বৃদ্ধা এমনকি ছেলেরাও এইগানে অংশগ্রহন করে থাকে। এইটুসু পূজো ও টুসুগানের উৎপত্তি কবে হয়েছে তা আমরা সন তারিখ নির্দিষ্ট করে বলতে পারি না, তবে এইটুকু অনায়াসেই বলতে পারি যে টুসু কোনো পৌরাণিক দেবী নয়, টুসু এই গ্রাম বাংলার ঘরের মেয়ে, যেন রক্তে মাংসে গড়া এক মানবী। গ্রামবাংলার নারীসমাজের কাছে এই টুসু প্রাণের দেবী, তাদের প্রাণসখী। তাই এই প্রাণসখীর কাছে তাদের মনের কথা সহজেই অকপটে বেরিয়ে আসে। বালিকা থেকে বৃদ্ধা সবরকম বয়সের নারী এই টুসুপূজো ও গানের সঙ্গে জড়িত থাকার জন্য এই টুসুগানের মধ্যে অন্তর্নিহিত রয়েছে নারীসমাজের জীবন জিজ্ঞাসার এক বৃহত্তর আলেখ্য। তাদের সুখ-দুঃখ, আশা-হতাশা, আবেগ-উচ্ছ্বাস, ভালোলাগা-মন্দলাগা, সামাজিক বিধিনিষেধ, জীবনের জটিল ও চির অমীমাংসিত সমস্যাগুলি স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই টুসুগানে ব্যক্ত হয়।

এখানকার মেয়েরা টুসুকে স্বর্গের দেবী রূপে কল্পনা করতে চান্‌নি, টুসু তাদের খেলার সাথী, প্রাণের সহচরী। টুসুগানে টুসুকে সখী বা সহচরী, বাড়ির মেয়ে, নববধূ কখনো বা মা ইত্যাদি রূপে কল্পনা করা হয়েছে।

পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর অবস্থান কোথায়? সমাজে নারীদের কত ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়? তাদের জীবনের নানা জটিলতা এই টুসুগানে প্রকাশিত হতে দেখা যায়। জন্ম থেকে বৃদ্ধা অবস্থায় পৌছানোর মাঝখানে একজন নারীকে কত বিচিত্র ধরনের কঠিন সমাজপীড়ার সম্মুখীন হতে হয় তা আমরা এই টুসুগানে ফুটে উঠতে দেখি।

আমি আমার এই প্রবন্ধে বিভিন্ন টুসুগানের উল্লেখ করে ও তাৎপর্য বিশ্লেষণের মধ্যদিয়ে নারীসমাজের অন্তর্বেদনাকে তুলে ধরার চেষ্টা করছি। টুসু গ্রামবাংলার লৌকিকদেবী, গরীব ঘরের মেয়ে, সেই গরীব পরিবারে নিত্য অভাব আর এই অভাব অনটনের কথা টুসুগানে অতি সহজেই ভাষা পেয়েছে—

"হামার বাপে মায়ে বিহা দিল
বড় শ্বশুর ঘর দেখ্যে।
হামার জনম গেল মাড়ভাত খাত্যে
কাল কাটাব কেমনেতে।।" [১]

"জনম দুঃখী মা গ হামি।
দু বেলা পেটে পড়ে না মাড়পনি।।
কাল যাব আড়শা হাটে।
শাল পাতা বিকব হাটে হাটে।।" [২]

খুব সুন্দরভাবে একটি দরিদ্র পরিবারের চিত্র এই গানে ফুটে উঠেছে। আমরা সহজেই অনুমান করে নিতে পারি যে নিতান্তই অভাব না থাকলে মানুষ "মাড়" অর্থাৎ ভাতের ফ্যান খেতে পারে না। কারো কারো মাড়পানি টুকুও জোটে না। অনুরূপ আর একটি গানে–

"আল্যে মা টুসু আমাদের ভাঙা ঘরে।
খাবার পান্তা ভাত টুকও জুটল্য না রে।।" [৩]

কিংবা

"বাপের ঘরে ছিলি মাগো খাতি পেট ভইরে।
শ্বশুর ঘরে বড় জ্বালা না পায় একদুভা মাড়রে।" [৪]

ভারতচন্দ্রের "অন্নদামঙ্গল" কাব্যের ঈশ্বরী পাটনীর মতো জগতের সমস্ত পিতামাতার একমাত্র ঐকান্তিক ইচ্ছা– "আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে"। তাই পিতামাতা মেয়ের বিয়ের সময় একটু ভালো (অর্থনৈতিক মানদণ্ডে) পরিবার দেখে মেয়ের বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু বাবা-মা ধনী পরিবার দেখে মেয়ের বিয়ে দিলেও শ্বশুরবাড়িতে মেয়ের অভাব থেকেই যায়। এইরকম অভাব থাকার জন্য এই জেলার নারীরা নিজেদের জাত ব্যবসায় অত্যন্ত মনোযোগী। আদিবাসী সাঁওতাল, ওরাং, টুডু,মুণ্ডা, ডোম, ঘাসি প্রভৃতি সম্প্রদায়ের নারীরা সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনির পর "হাঁড়িয়া" ও "মহুল্যা" প্রভৃতি মদের নেশায় মশগুল হয়ে নিজেদের পরিশ্রম ও দারিদ্রতার অবমাননাকে দূর করার চেষ্টা করে। কেউ কেউ মদ বেচে, আমরা টুসুগানে পাই—

"মাঝাইন বস্যে গ কুল্হি মুড়ায়।
হাঁইড়্যা বিকে গ ঠোঙায় ঠোঙায়।।" [৫]

শীতকালের হাড়কাঁপানো শীতে এই অভাবী মানুষগুলোকে নিদারুন কষ্ট সহ্য করতে হয়, তারই ছবি ধরা পড়েছে টুসুগানে:

"পউস মাসের কন্ কনা জাড়ে
জাড় যায় না গ চাদর কাপড়ে।

অ-টুসু গাএ দিব কোন কাপড়
রুখা গা বড় গো চিমড়।।"[৬]

গ্রাম বাংলার নারী সমাজের একটা অন্যতম মর্মান্তিক সমস্যা হল তাদের বিবাহকেন্দ্রীক সমস্যা। দেখা গেছে মেয়ের বিয়ে দিয়ে বাবা-মায়েরও শান্তি নেই, মেয়েরও সুখ নেই। তবুও জন্মানোর পর ছোটো থেকে আদর যত্নে লালন পালন করে একটা মেয়েকে বড় করার পর অবশেষে অন্যের বাড়িতে পাঠাতে হয়। এই বিবাহ কেন্দ্রীক গ্রামবাংলার নারী সমাজের নানা সমস্যা, অভাব-অভিযোগ ও প্রতিবাদ টুসুগানে ধ্বনিত হয়েছে। আমার জানি কয়েকদশক আগে বাড়িতে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে নারীদের মতামত নেওয়া হয় না, তাদছর মতামতকে কোনো গুরু দিতে রাজি নয় আমাদের পুরুষতান্ত্রিক সমাজ। শহরে ইদানিং এই সমস্যা কিছুটা মিটেছে কিন্তু পুরুলিয়া জেলার প্রত্যন্ত গ্রামগুলোতে এখনো এই সমস্যা তার প্রচীন বৈশিষ্ট্য ও সংস্কার নিয়ে বিদ্যমান। আর আমরা জানি এই টুসুগান বেঁচে সেইসব প্রত্যন্ত গ্রামের লেখাপড়া না জানা মানুষদের চর্চার মধ্যে। এই সমাজে প্রচলিত নারীদেরএকটি অন্যতম প্রধান সমস্যা হল বাল্যবিবাহ। অনেকক্ষেত্রে অনিচ্ছা সত্ত্বেও বালিকা বয়সে নারীদের বিয়ে দেওয়া হয়। আমরা জানি বাল্যবিবাহে পুরুলিয়া জেলা এগিয়ে, সেই বাল্যবিবাহের কথা টুসুগানে ফুটে উঠেছে—

"টুসু হামার ছুট্ট ছ্যালা শ্বশুর ঘরের বড় কলসী কাঁখে লিতে লারে গ।
বাঁধের ঘাটে কলসী রাখ্যে পালাঁয় আল্য বাপের ঘরে গ।।" [৭]

আলোচ্য এই টুসু গানে দেখা যাচ্ছে— যে বয়সে মেয়েদের এক কলসী জল বয়ে আনার মতো শারিরীক ক্ষমতা থাকত না সেই বয়সে মেয়েকে বিয়ে দেওয়া হতো। অনুরূপ বিষয়ের আর একটি গান উল্লেখ করা হল-

কলঙ্কাটির জবা ফুলটি হলুদ বল্যে বাটেছি
ও শাশুড়ি গাল দিও না পাশ খেইলতে বস্যেছি।।[৮]

এইগানে দেখা যাচ্ছে যে বয়সে মেয়েরা খেলাধুলা করে সেই বয়সে সংসার করছে। আবার "টুসু হামার বড় আদরের মেয়ে গো।"–এই আদরের মেয়েকে বাল্য বয়সে বিবাহ না দিয়ে বাড়িতে রাখা যে কত দুশ্চিন্তার ব্যাপার তা অনবদ্য ভাবে এই টুসুগানে প্রকাশিত হয়েছে—

"টুসু হামার ডাগর মেয়ে ঘরে রাইখ্ব কি করে গো
কুথায় খুঁজে পাব আমি সাত রাজার ধন গো।"[৯]

পুরুলিয়ার গ্রামবাংলায় প্রচলিত এক ভয়ঙ্কর সামাজিক কুপ্রথা হল পণ প্রথা। মেয়ের বিয়ের পণ দিতে গিয়ে পিতা মাতা কীভাবে সর্বস্ব হারিয়ে কাঙালে পরিণত হয় তারই করুণ ও মর্মান্তিক ছবি টুসুগানে উদ্‌ভাসিত হয়ে ওঠে—

"বিটির বিহায় গেল গো টুসু ভিটামাটি।
শাশুড়ি-ননদী মাগী বড় ঝগড়াটি।।
বিটির হল্য ঘর করা দায়।
আমি ভাব্যে মরে যায়।।"[১০]

"টুসু বিটির বিহা দিব কেমনে
পণের জ্বালায় বিটির বাপ ভাবে মনে মনে
যদি থাকে দুটি বিটি বিকায় হে সব ভিটে মাটি।"[১১]

আলোচ্য গান দুটিতে দেখা যাচ্ছে যে মেয়ের বিয়ের পণ দিতে গিয়ে পিতামাতা তাদের শেষ সম্বল ভিটেমাটি পর্যন্ত হারাচ্ছে তারই করুন ও মর্মান্তিক ছবি। আবার নিজের সর্বস্ব খুইয়ে মেয়ের বিয়ে দেওয়ার পরেও বাবা যখন জানতে পারেন —"শাশুড়ি-ননদী মাগী বড় ঝগড়াটি" এবং এই ঝগড়ার জন্য মেয়ে শ্বশুর বাড়ি ছেড়ে বাবার বাড়িতে ফিরে এসেছে তখন বাবা-মায়ের উদ্বেগের শেষ থাকে না।

মেয়েকে শ্বশুর বাড়ি পাঠানোর সময় মাতৃহৃদয়ের যে ব্যাকুলতা তার চূড়ান্ত প্রকাশ এই টুসুগানে অনুরণিত হয়ে ওঠে-

"যাব যাব বল না গ টুসু
আসি আসি বল
কাল পরশু বাপকে পাঠাব
শাশুড়িকে আসতে দিতে বল।" [১২]

টুসুগানের এই জায়গাটাতে শাক্তপদাবলীর সঙ্গে এর সাদৃশ্য দেখা যায়। নব বিবাহিত মেয়েকে বাড়ি নিয়ে আসার জন্য মা মেনকার উদ্বেগের সঙ্গে গ্রামাবাংলার মাতৃ হৃদয়ের উদ্বেগ ও ব্যাকুলতা একাকার হয়ে গেছে:
শাক্তপদাবলীতে পাওয়া যায়–

"যাও যাও গিরি আনিতে গৌরী,
উমা বড়ো দুঃখে রয়েছে।"

টুসুগানে দেখা যায়–

"অ-মনুর বাবা যাও হে তাড়াতাড়ি।
হামার টুসু আইসবেক বাপের বাড়ি।।" [১৩]

বিবাহিত মেয়ের শ্বশুর বাড়িতে একটা বড় সমস্যা হল শাশুড়ি,ননদী ও সতীনের সঙ্গে কলহ। আমার মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে এই ধরনের কলহের কথা পেয়েছি। আমাদের আলোচ্য টুসুগানেও এই সতীন কলহের কথা পাওয়া যায়:

"টুসু মাগো সতীনকে কিছু বইল না।
মাগী বাদী গো লিয়ায় লাগিল।।" [১৪]

"ভালো কইরে থাকবে মা সতীনের ঘরে গো।" [১৫]

"শাশুড়ি ননদী বড় কাল দেয় না দু মুঠা ভাত।
খাটো খাটো জীবন গেল হল্য রোগ বাত।" [১৬]

সতীনের ঘরে মেয়েকে বিয়ে দেবার জন্য মা বাবার ব্যাকুলতা এই গানগুলোতে ফুটে উঠেছে। শুধুমাত্র শাশুড়ি ননদী ও সতীন নয়, নিজের স্বামীর কাছ থেকেও বিভিন্ন ধরনের অত্যাচার সহ্য করতে হতো। এককথায় বলা যায় যে বিবাহের পর নারীরা শ্বশুরবাড়িতে চরম লাঞ্ছনার শিকার হতো। তবে এই দুর্ভাগ্য সমস্ত মেয়ের কপালে লিপিবদ্ধ ছিল না। আমার টুসুগানে দেখতে পায়–

"বাপে মায়ে পাঠালেক শ্বশুর ঘরে
ও টুসু ভাত দিল না বরে।" [১৭]

স্বামী মাতাল হলে নারীর যে দুরবস্থা হয় তারও অসাধারণ ছবি এইটুসুগানে ফুটে ওঠে–

"এমন বরে দিল বিহা কাঁদ্যে কাঁদ্যে ফাটে হিয়া।
ভাটিশাল লে আস্যে রাঙা চইখ্যে ঘাড় ধাক্কায়।" [১৮]

মেয়েদের বিবাহ পরবর্তী জীবনের এইরকম নানান জটিল সমস্যার কথ ভেবে মেয়েকে বিয়ে দিতে গিয়ে মায়ের অন্তর্বেদনা ও সাবধান বাণী উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে এইভাবে—

"ভালো কইরে শ্বশুর ঘরে থাইক্‌বে টুসু গো
ননদ ভাজের সঙ্গে ঝগড়া কইরো না। ।" [১৯]

জামাইয়ের কাছে মায়ের একান্ত অনুরোধ –

"শাশুড়ি ননদের ঘরে জামাইবাবা টুসু ধনে কর আদর।" [২০]

পাড়ার কোনো বিয়ের বিয়ে হয়ে সে মেয়ে শ্বশুরবাড়ি চলে গেলে মায়ের কোল শূন্য হয়ে যায়, ফলে মাতৃহৃদয়ে যেরূপ বেদনা সৃষ্টি হয়, অনেকটা সেইরকমই বেদনা সৃষ্টি হয় বিবাহিতা মেয়েটির বাল্যসঙ্গিনীটির। হয়তো মায়ের অন্তর্বেদনার কাছে সেটা কিছুটা ম্রিয়মাণ হলেও একেবারে উপেক্ষার যোগ্য নয়, টুসুগানে এই বিষয়টা খুব সুন্দর ভাবে স্পষ্ট হয়েছে—

"টুসু খেইলব কার সঙ্গে।
সঙতি চইল্য বরের সঙ্গে।।" [২১]

এইভাবে টুসুগানগুলো পাঠ ও বিশ্লেষণ করলে আমরা খুব সহজেই পুরুলিয়ার গ্রামবাংলার নারী সমাজের মনের অন্তর্বেদ-নাকে অনুধাবন করতে পারব। নারীদের জীবনের অজস্র বিশ্বাস ও সংস্কার, সামাজিক প্রথা রীতিনীতি একাকার হয়ে আছে এইগানগুলোর মধ্যে। আট-দশ বছর বয়সে যখন পুতুল নিয়ে খেলা করার সময় সেই সময় থেকে এই নারীরা সংসারের ঘানি টানে এবং বয়স পনেরো না হতেই সন্তান উৎপাদনের যন্ত্রে রূপান্তরির হয়। তারপর সাংসারিক দায়িত্ব, সন্তানের লালন পালন, শাশুড়ি-ননদ-জায়ের সঙ্গে কলহ , সংসারের অভাব অনটন ইত্যাদির সাথে সাথে লড়াই করতে গিয়ে কি নিদারুন ও মর্মান্তিক কষ্ট সহ্য করতে হয় একজন নারীকে তারই আলেখ্য এই টুসুগান। সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন কুপ্রথা ও বিধিনিষেধের সঙ্গে লড়াই করে গ্রামবাংলার নারীদের এক অনবদ্য দলিল এই টুসুগান। গ্রাম বাংলার খেটে খাওয়া শ্রমজীবী ও অভাবী মানুষের মুখে মুখে রচিত হয়েছিল বলেই এই গানগুলোর মধ্যে গ্রামাবাংলার নারীসমাজের সামাজিক ছবিটি এতটা স্পষ্ট ভাবে ফুটে উঠেছে। বিশেষ করে নারী সমাজের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহনে টুসুপূজো ও টুসুগান সার্থকতা লাভ করে বলেই এই টুসুগানে নারীদের মনের গহনে থাকা অনুভূতিগুলো অনায়াসেই বেরিয়ে আসে।

তথ্যসূত্র :

১. মণ্ডল, ড.দয়াময়, পুরুলিয়ার লোকসঙ্গীতে লোকজীবন : অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ, প্রজ্ঞা বিকাশ, প্রথম প্রকাশ, ১লা বৈশাখ, ১৪২৮। পৃ. ৪৯
২. (ক্ষেত্রসমীক্ষা) সুজলা কুমার, বয়স-৫৫, গ্রাম+থানা- আড়শা, পুরুলিয়া
৩. ঐ
৪. ঐ
৫. মণ্ডল, ড.দয়াময়, পুরুলিয়ার লোকসাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতি ভাবনা, প্রজ্ঞা বিকাশ, প্রথম প্রকাশ, ম্ ২০১৭, পৃ.১২
৬. (ক্ষেত্রসমীক্ষা) মিঠু রাজোয়াড়, বয়স-২৮, গ্রাম-মালথোড়, থানা-পাড়া, পুরুলিয়া
৭. (ক্ষেত্রসমীক্ষা) বিজলা গড়াত, গ্রাম+থানা-আড়শা, পুরুলিয়া
৮. (ক্ষেত্রসমীক্ষা) মিঠু রাজোয়াড়, বয়স-২৮, গ্রাম-মালথোড়, থানা-পাড়া, পুরুলিয়া
৯. (ক্ষেত্রসমীক্ষা) টুসুবালা সিং সর্দার বয়স-৫৮, গ্রাম-ফস্কো, থানা-আড়শা, পুরুলিয়া
১০. মণ্ডল,ড.দয়াময়,পুরুলিয়ার লোকসঙ্গীতে লোকজীবন: অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ,প্রজ্ঞা বিকাশ, প্রথম প্রকাশ ১লা বৈশাখ ১৪২৮, পৃ. ৬৮

১১. (ক্ষেত্রসমীক্ষা) সুজলা কুমার, বয়স-৫৫, গ্রাম+থানা-আড়শা, পুরুলিয়া
১২. মণ্ডল, দয়াময়,পুরুলিয়ার লোকসঙ্গীতে লোকজীবন: অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ,প্রজ্ঞা বিকাশ, প্রথম প্রকাশ ১লা বৈশাখ ১৪২৮, পৃ. ৪৯
১৪. (ক্ষেত্রসমীক্ষা) টুসুবালা সিং সর্দার, বয়স-৫৮, গ্রাম-ফস্কো, থানা-আড়শা, পুরুলিয়া
১৫. ঐ
১৬. ঐ
১৭. মণ্ডল, দয়াময়,পুরুলিয়ার লোকসাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতি ভাবনা,প্রজ্ঞা বিকাশ, প্রথম প্রকাশ মে ২০১৭, পৃ. ২১
১৮. তদেব, পৃ. ২১
১৯. মিঠু রাজোয়াড়, বয়স-২৮, গ্রাম-মালথোড়,থানা-পাড়া পুরুলিয়া
২০. মণ্ডল, দয়াময়, মানভূমের টুসু ভাদু ও ঝুমুর,প্রজ্ঞা বিকাশ, প্রথম প্রকাশ, মহালয় ১৪২৮, পৃ. ২১
২০. মণ্ডল, দয়াময়, পুরুলিয়ার লোকসাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতি ভাবনা, প্রজ্ঞা বিকাশ, প্রথম প্রকাশ, মে ২০১৭, পৃ. ১২
২১. তদেব, পৃ. ৬২

সহায়ক গ্রন্থ :

১. ভট্টাচার্য, আশুতোষ, বাংলার লোকসাহিত্য, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট অফ ইণ্ডিয়া, মুদ্রণ ১৯৮২
২. মন্ডল, দয়াময়, পুরুলিয়ার লোকসঙ্গীতে লোকজীবন : অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ, প্রজ্ঞা বিকাশ, প্রথম প্রকাশ, ১লা বৈশাখ ১৪২৮
৩. করণ, সুধীর কুমার, সীমান্ত বাংলার লোকযান
৪. মণ্ডল, দয়াময়, মানভূমের টুসু ভাদু ও ঝুমুর, প্রজ্ঞা বিকাশ, প্রথম প্রকাশ, মহালয়া ১৪২৮

সাক্ষাৎকার :

১. টুসুবালা সিং সর্দার, বয়স-৫৮, গ্রাম-ফস্কো, থানা-আড়শা, পুরুলিয়া
২. মিঠু রাজোয়াড়, বয়স-২৮, গ্রাম-মালথোড়, থানা-পাড়া, পুরুলিয়া
৩. সুজলা কুমার, বয়স-৫৫, গ্রাম+থানা-আড়শা, পুরুলিয়া
৪. ভীষ্ম কুমার, বয়স-৪৫, গ্রাম+থানা-আড়শা, পুরুলিয়া
৫. দয়াময় মণ্ডল, বয়স-৫০, গ্রাম-গুনিয়াড়া, পুরুলিয়া